আদর্শ শিক্ষকের কতিপয় গুণ

আব্দুল হামীদ মাদানী

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

শিক্ষক অনেক দেখেছি, আরব-আজমের অনেক শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষা পেয়েছি, কিন্তু উস্তাযুল আসাতিযা শায়খুল হাদীস মওলানা আব্দুর রঊফ শামীম সাহেব (রাহিমাহুল্লাহ)র মত এমন আদর্শ শিক্ষক কোথাও দেখিনি।

জামেআহ 'রিয়াযুল উলূম' মহিষাডহরীতে ছাত্র হিসাবে পড়তে আসার পূর্ব থেকেই আমি তাঁর সাহিত্যমন্ডিত মিষ্টিমধুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হই। একদা পুবার মাদ্রাসায় তাঁর জালসা। মনে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য। কিন্তু তাঁর সময় আসার পূর্বেই বৃষ্টি শুরু হল। নিরাশ মনে গভীরভাবে দুঃখিত হলাম। তবুও কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় মসজিদের দুতলায় ভাঙ্গা-মজলিসে তাঁর যে বক্তৃতাই হল, তাতে এ ভক্তের মন বিজিত হয়েছিল।

মনের আকর্ষণ ছিল তাঁর প্রতি। পুবার মাদ্রাসা ত্যাগ করার পর সেখানে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন আমার গ্রামের ইমাম সাহেব।

তিনি বললেন, 'অমুক দিনে আমার বাড়ি যাবে। আমি তোমাকে নিয়ে মহিষাডহরী মাদ্রাসায় ভরতি ক'রে দেব।'

তাঁর বাড়ি বিষিয়ায়। ছুটিতে গেছেন বাড়ি। সেইদিন আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। অচেনা দেশ, অজানা পথ। বীরচন্দ্রপুরে নেমে হাঁটার পথ। এক জায়গায় সাইকেল খেলা চলছে। নারী-পুরুষের গোলাকার ভিঁড়। তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিষিয়া কোন্ দিকে?'

রাস্তা দেখিয়ে দিলে গ্রামের ধারে পৌঁছে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আব্দুল হাকীম মৌলবী সাহেবের বাড়ি কোথায়?'

তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কুথি থেকে আসছ গো?'

আমি বললাম, 'বর্ধমানের আলেফনগর থেকে।'

বলল, 'অ। আমার সাথে এস।'

তিনিই মৌলবী সাহেবের বড় ছেলে। তাঁর পিছন ধরলাম। যেতে যেতে তিনি বললেন, 'সে তো বাড়িতে নাই। দু-একদিন পরে আসবে।'

আমি মনে মনে বললাম, 'তাহলেই হয়েছে।' প্রকাশ্যে বললাম, 'তাহলে আর গিয়ে লাভ নেই। আমি বাড়ি ফিরে যাই।'

বললেন, 'দুপুর বেলা। দুটো খেয়ে-দেয়ে যাও।'

ক্ষিদেও লেগেছিল। কথা মত বাড়ির কোঠায় উঠলাম। ডিমের বড় আকারের পিঠে দিয়ে ভাত খেয়ে বললাম, 'আমি থাকব না, চলে যাই। বামদেব ট্রেনটা পেয়ে যাব।'

তিনি থাকতে বলা সত্ত্বেও একান্ত অপরিচিত জায়গায় আমি না থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বীরচন্দ্রপুরে এসে বাস পেতে দেরী হল। সাঁইথিয়া ঢোকার আগেই ট্রেন বেরিয়ে গেল।

তারপর আর কোন ট্রেন নেই, যাতে আমার বাড়ি পৌঁছনো সম্ভব হয়। অত্যন্ত মন খারাপ হল। নানা চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করলাম, মহিষাডহরী তো শুনেছি সাঁইথিয়ার কাছে। একাই মহিষাডহরী চলে যাই। কিন্তু সেটাও তো অজানা পথের অচেনা স্থান। সম্মুখে শীতের রাত। বাস-স্ট্যান্ডে জিজ্ঞাসা করলাম মহিষাডহরী যাবার পথ। বলল, মহিষাডহরীর বাস নেই, রোঙ্গাইপুরে নেমে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে হবে। সকালে ট্রেন আছে, মহিষাডহরীতে স্টেশন আছে।

আল্লাহর নাম নিয়ে স্টেশনের প্রতীক্ষালয়ের বেঞ্চে চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে গেলাম। মাথায় অসাফল্যের নানা দুশ্চিন্তা, চেহারায় মশার কামড় এবং যাত্রী ও হকারদের হৈচৈ-এর মাধ্যম দিয়ে রাত কেটে গেল। সকাল হলে ট্রেনের টাইম জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলাম, প্রায় সাড়ে আটটায় ট্রেন। তখন বাস-স্ট্যান্ড ছিল স্টেশনের লাগাও। সিউড়ির বাস পেয়ে গেলাম।

রোঙ্গাইপুরে নেমে অজানা গ্রামের প্রতি উদাস মুসাফির হয়ে হাঁটতে লাগলাম। কি জানি, একা গিয়ে যদি ধাক্কা খেতে হয়?

মাদ্রাসার আঙিনায় প্রবেশ করতেই ভাগ্যক্রমে উস্তায মওলানা আব্দুল হাকীম রিয়াযী (রঃ) সাহেবের সাথে দেখা। তখন ওশর আদায়ের ছুটি। মাদ্রাসায় অন্য কেউ নেই। পরিচয় বিনিময়ের পর আমার আসার উদ্দেশ্য জানালাম। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ গো তোমার ভরতি হয়ে যাবে। কারণ হিদায়াতুন নাহু ক্লাশে মাত্র একটিই ছাত্র আছে। তুমি এক কাজ কর, হেড মওলানার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে নাও।'

মনের ভিতরে যেন সাফল্যের আলোর ঝিলিক দেখতে পেলাম। বললাম, 'তিনি কোথায়?'

তিনি বললেন, 'বাড়িতে। অবিনাশপুর চলে যাও। এক্ষনই ন'টার ট্রেন আসবে। ট্রেন ধরে সিউড়িতে নেমে বোলপুরের বাস ধরে সেকমপুরে নামবে। সেখান থেকে আবার বাস ধরে কিংবা রিক্সা ক'রে অবিনাশপুর চলে যাবে।'

ইতিমধ্যে ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। কাল বিলম্ব না ক'রে স্টেশনের দিকে ছুট দিলাম। কিন্তু এত লম্বা রাস্তার ভাড়া কাছে আছে তো?

ভাড়ার ভয়েই গতকাল রাত্রে সাঁইথিয়ায় কিছু খাইনি। সকালেও কিছু না। মহিষাডহরী এসেও কিছু খাওয়ার সুযোগ হল না। দেখি বাকী পেট্রলে গাড়ি কদ্দূর যায়?

নির্দেশনা অনুযায়ী সিউড়ি স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলাম। সেখান থেকে বোলপুরের বাস ধরে সেকমপুরে এবং সেখান থেকে হেঁটে অবিনাশপুর গেলাম। ক্ষিদেয় যেন রাস্তা দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয় হেড মওলানার ঘরে আজ রুজি আছে।

কিন্তু কোথায়? জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে তাঁর বাড়ির কাছে দেখলাম এক মুরুব্বী কাস্তে দিয়ে ছানি কেটে গরুকে খেতে দিচ্ছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শামীম সাহেবের বাড়ি কোথায়?'

তিনি ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলে তাঁর বাড়ির দরজায় করাঘাত করলাম। সাথে সাথে একটি মেয়ে বের হয়ে এলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মওলানা সাহেব আছেন বাড়িতে?'

সে বলল, 'না। মাদ্রাসার আদায়ে গেছে।' তারপর আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা না ক'রে বাড়ি প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

নিরাশ মনে আঘাতের পর আঘাত খেলাম। সাফল্যের আলোর ঝিলিক দেখার পর আবার মনের আকাশে নিরাশার ঘনঘটা মেঘের অন্ধকার দেখতে লাগলাম। সেই কাল দুপুরে ভাত খেয়েছি। এখন কি করি? এখন যার হাতে আমি প্রত্যহ ৪/৫ বার খাই, সে তখন একটিবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করল না যে, 'কে আপনি?' বলল না যে, 'দু মুঠো ভাত খেয়ে যান।'

বলবেই বা কেন? সে কি তখন জানে যে, সেই একদিন আমার পাশে বসে আমাকে ভাত খাওয়াবে?

পক্ষান্তরে তিনি থাকলে হাজার অপরিচিত হলেও তিনি নিশ্চয় খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। যেহেতু তিনি ছিলেন বড় মেহমান-নেওয়ায।

হতাশার অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে খেতে মাঠে মাঠে সোজা হেঁটে ফিরে এলাম সেকমপুরে। সে পা কি হাঁটতে চায়? গরীব না হলে অবশ্যই হাঁটত না। বাস ধরে বোলপুর এসে ভাবলাম কিছু খাই। কিন্তু ট্রেনের টিকিট কাটার পর এমন পয়সা ছিল না যে, তার দ্বারা কিছু কিনে খাওয়া যাবে! তারপরেও গুসকরা থেকে আলেফনগরের বাসভাড়ার জন্য কতক পয়সা রাখতে হল।

প্লাটফর্মে বসে চোখে আলোর ফুলঝুরি দেখতে লাগলাম। গা-পাক দিয়ে বমি শুরু হয়ে গেল। শুকনো বমি। পেটে একটা দানাও নেই। হায়রে ক্ষুধার জ্বালা! সে জ্বালা নিঃস্ব গরীব ও ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বুঝবে? জীবনে সুখের সন্ধান করতে গিয়ে কত যে কষ্ট সহ্য করতে হয়, তা ভুক্তভোগীরাই জানে।

বাড়ি ফিরলাম সন্ধ্যাবেলায়। বাড়ি এসে জ্বলা পেট ঠাণ্ডা হল।

পরবর্তীতে মাদ্রাসা খুললে গ্রামের ইমাম সাহেবকে নিয়ে গিয়ে ভরতি হলাম। আদর্শ উস্তাযের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল আমার প্রতি। কিছুদিনের মধ্যেই আমি সেখানকার জমাদার হয়ে উঠলাম। পরীক্ষায় মাদ্রাসার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলাম। ওস্তাদ ও মাদ্রাসা-কমিটির কাছে আমি প্রিয় হয়ে উঠলাম। যে মানুষটির সাহচর্য লাভের জন্য এতদিন তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তিনি এখন আমার উস্তায। নিয়মিত তাঁর নিকট বসে ক্লাশ করতে লাগলাম। নিশ্চয় তা আমার জন্য বড় সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় ছিল।

তাঁর মধ্যে যেসব গুণাবলী ছিল, তার মধ্যে একটি হল গাম্ভির্য। তাঁর গলার আওয়াজেই ছাত্রদের মনে এক প্রকার সমীহ সৃষ্টি হত। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কথা বলার মত ক্ষমতা কারো ছিল না। কোথাও গোলমাল চললে, তাঁর আওয়াজ পেতেই মজলিস নিঝুম হয়ে যেত।

জীবনের প্রথম হাত-ঘড়ি কিনে তাঁর সামনে ব্যবহার করতাম না। কোন সময় সামনে পড়ে গেলে হাতটিকে পিছনে লুকিয়ে নিতাম।

তাঁকে বড় 'কড়া উস্তায' বলে মনে হত। অথচ তিনি তা ছিলেন না। কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি ছড়ি ব্যবহার করতেন না, কথার মার ব্যবহার করতেন। আর তা ছিল ছড়ি অপেক্ষা আঘাতে অধিক গভীর। তবে তিনি অসভ্য কথা বলতেন না।

উস্তাদজীর মধ্যে আরো যে গুণটি লক্ষ্য করেছি, তা হল সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যশীলতা। বিশাল সমুদ্রের পাশে বসে দেখলে দেখা যায় যে, পর্বতসম কত বিশাল বিশাল তরঙ্গমালা তার বুকে এসে আছড়ে পড়ে, কিন্তু সমুদ্র-সৈকত তা যেন সাদরে বরণ ক'রে নেয়। উস্তাদজী ছিলেন তেমনই একজন ধৈর্যের পাহাড়।

লক্ষ্য করেছি, মাদ্রাসার কত মিটিং-এ তাঁকে কত কথা বলা হচ্ছে, আর তিনি সেসব কথা বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য ক'রে নিচ্ছেন।

কোন ছাত্রের উৎপাতের কারণে কোন মানুষ এসে তাঁকে অপমানমূলক কথা বলছে, আর তিনি তা নীরবে সহ্য ক'রে যাচ্ছেন এবং প্রয়োজনে ক্ষমা চাচ্ছেন, ওযর পেশ করছেন।

ছেলে-মেয়েরা তাঁকে কত কষ্ট দিচ্ছে, সেই পরম শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয় ব্যক্তিত্বে আঘাত দিয়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছে, তাঁর সুনামের স্বর্ণগাত্রে বদনামের কর্দম লেপন করছে, আর তিনি তা চোখ বুজে সহ্য ক'রে নিচ্ছেন, সামর্থ্যানুযায়ী পরিস্থিতির সামাল দিচ্ছেন।

অনেকে ছোট হয়ে সেই মহান ব্যক্তিত্বকেও ছোট করতে চাচ্ছে, আর তিনি নীরবে তা সহ্য ক'রে যাচ্ছেন।

তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা তাঁর কানে পৌঁছে দিলে তিনি বলেছেন, 'বলতে দাও গো, ওরা বুঝে না।'

কত শত আঘাতের পর আঘাত তাঁর বক্ষ-বিদারণ ক'রে দিচ্ছে, আর তিনি নীরবে সবকিছু সহ্য ক'রে যাচ্ছেন।

'ধীর পানিতে পাথর কাটে' মুহতারামের এ গুণ বড় শিক্ষণীয়। ধৈর্যের বিশাল নমুনা তিনি, সহ্যের বিশাল পর্বত তিনি, এ শিক্ষা তাঁর নিকট থেকে শিখলেও আমরা পারি না তাঁর নযীর সৃষ্টি করতে।

তাঁর মধ্যে আরো একটি গুণ ছিল 'ফিরাসাহ' (বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা)। প্রত্যেক বিষয়ের পরিণাম তিনি বিশেষভাবে খেয়ালে রাখতেন। এ জন্য অবাক হয়ে অনেকে বলত, 'উনার চারটা চোখ আছে!'

বর্তমানের আকাশে কালো মেঘ দেখে তিনি পিছিয়ে যেতেন না, বরং ভবিষ্যতের আশার উজ্জ্বল সূর্য তিনি দেখতে পেতেন। আর সেই আশা নিয়েই পথ চলতেন।

জীবন-সায়াহ্নে তিনি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। পরপারের প্রস্তুতি স্বরূপ তাঁর আমল বর্ধমান ছিল। এক রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে তিনি বললেন, 'জীবনে অনেক শৈথিল্য আছে। এখন সেই ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করছি বাবা!'

রাতের ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁকে 'দুআ' করতে বলেছি। তিনি দুআ করেছেন। মনের গভীরে কত সুখ অনুভব করেছি সেই রাতে।

আমার আব্বা মারা গেছেন পূর্বেই। অভিভাবক হিসাবে তাঁকে হারিয়ে আমরা আমাদের মাথার ছাতা বরং মাথাই হারিয়েছি।

উস্তাদজীর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ যেটা ছিল, তা হল উদারতা ও বিনয়। তাঁর মধ্যে অহংকার মোটেই ছিল না।

তিনি ছাত্রের লেখা বইও পড়তেন এবং গুরুত্বের সাথে পড়তেন। শেষ জীবনে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে আমাকে ফোনে বলেছিলেন, 'তোমার "সুখের সন্ধান" বইটি পড়ে সুখের খোঁজ করছি বাবা!'

একদা তিনি বাড়ি থেকে পিচকুড়ি আসার পথে ট্রেনে বসে আমার 'বিনা পণের বউ' বইটি পড়ছিলেন। তাঁর ভাষায় 'বইটির ঘটনা-প্রবাহে এমন মুগ্ধ হয়ে গেছি যে, পিচকুড়ি স্টেশন কখন পার হয়ে গেছে আর খেয়ালই করিনি! পরের স্টেশন গুসকরায় নেমে পরের ট্রেনে আবার পিচকুড়ি ফিরে আসি।'

পক্ষান্তরে আমার বই পড়তে দিলে অনেক মুহতারাম তা টেবিলে ছুঁড়ে রাখেন এবং অনেকে বলেন, 'ও বই আমার পড়া আছে!'

তাঁর মধ্যে কোন গোঁড়ামিও ছিল না। কোন মসলা-মাসায়েল নিয়ে তিনি বৃথা তর্ক করতেন না। অধিকাংশ সময়ে তিনি বলিষ্ঠ দলীল দেখে বিপক্ষের মত মেনে নিতেন। আমরা ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মতামত তিনি সাদরে গ্রহণ করতেন।

তাঁর মতের বিপক্ষে কোন বই পড়তে দিলে, তিনি তা পড়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলে মত পরিবর্তন ক'রে নিতেন। আর এটাই হল জ্ঞানী মানুষদের বিশেষ গুণ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾ (١٧-١٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে -- যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। (সূরা যুমার ১৭- ১৮ আয়াত)

কোন মতকে তিনি তাচ্ছিল্য করতেন না; বরং চাইতেন, যাতে তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেছেন, সেই সত্য বিপক্ষও উপলব্ধি করুক। কিন্তু তিনি তর্ক-বিবাদ ও মুনাযারা পছন্দ করতেন না।

১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে উমরাহ আদায় করতে এসে তিনি আমার বাসায় আসেন। এখানকার পরিবেশ থেকেও যে শিক্ষণীয় বিষয় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তার মধ্যে একটি এও যে, বিতর্কিত মসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে উদার হতে হবে এবং গোঁড়ামি বর্জন করতে হবে। সেই সময় ঝড় চলছিল 'রুকূ থেকে উঠে হাত কোথায় থাকবে' এই বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে।

তাঁর নিকট থেকে অনেক কিছু শিখেছি, অনেক স্নেহ-দুআ পেয়েছি। একজন আদর্শ শিক্ষকের যে গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, তা ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁকে হারিয়ে আমরা সাত রাজার ধন মানিক হারিয়ে ফেলেছি।

পরিশেষে দুআ ক'রি,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِى جَمَالٍ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِى عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِى قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.